মুক্তি

(গল্পগ্রন্থ – নবাগত)

ওর ভাল নাম বোধ হয় ছিল নিস্তারিণী। ওর যৌবন বয়সে গ্রামের মধ্যে অমন সুন্দরী বউ ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যেও ছিল না। ওরা জাতে যুগী, হরিনাথ ছিল স্বামীর নাম। ভদ্রলোকের পাড়ায় ডাকনাম ছিল 'হ'রে যুগী'।

নিস্তারিণীর স্বামী হরি যুগীর গ্রামের উত্তর মাঠে কলাবাগান ছিল বড়। কাঁচকলা ও পাকাকলা হাটে বিক্রি করে কিছু জমিয়ে নিয়ে ছোট একটা মনোহারি জিনিসের ব্যবসা করে।রেশমি চুড়ি ছ'গাছা এক পয়সা, দু'হাত কার এক পয়সা—ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে মনে হ'ল, 'কার' মানে ফিতে বটে, কিন্তু 'কার' কি ভাষা? ইংরিজিতে এমন কোনো শব্দ নেই, হিন্দি বা উর্দুতে নেই, অথচ 'কার' কথাটা ইংরিজি শব্দ বলে আমরা সকলেই ধরে নিয়ে থাকি! যাকসে, হরি যুগীর বাড়িতে দুখানা বড় বড় মেটেঘর, একখানা রান্নাঘর, মাটির পাঁচিল-ঘেরাবাড়ি। অনেক পুষ্যি বাড়িতে, দু'বেলা পনেরো-ষোলোখানা পাত পড়ে। হরি যুগীর মা, হরি যুগীর দুটি ছোট ভাই, এক বিধবা ভাগ্নী, তার দুই ছেলেমেয়ে। সংসার ভালই চলে, মোটা ভাত, কলাইয়ের ডাল ও ঝিঙে ও লাল ডাঁটাচচ্চড়ির অভাব কোনোদিন হয়নি, গোরুর দুধওছিল চার-পাঁচ সের। অবিশ্যি দুধের অর্ধেকটা ব্রাহ্মণপাড়ায় যোগান দিয়ে তার বদলে টাকাআসতো।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বউ-ঝির কথা উঠলে সকলেই বলতো—হ'রে যুগীর বউয়ের মতোপ্রায় দেখতে! গ্রামের নারী-সৌন্দর্যের মাপকাঠি ছিল নিস্তারিণী। গেরস্তঘরের বউ, স্নান করেভিজে কাপড়ে ঘড়া কাঁখে নিয়ে যখন সে গাঙের ঘাট থেকে ফিরতো, তখন তার উদ্দামযৌবনের সৌন্দর্য অনেক প্রবীণেরমুণ্ডুঘুরিয়ে দিত।

এ গ্রামে একটা প্রবাদ আছে অনেকদিনের।

তুলসী দারোগা নদীর ঘাটের পথ ধরে নীলকুঠীর ওদিক থেকে ঘোড়া করে ফিরবার সময়ে তুঁতবটের ছায়ায় প্রস্ফুট তুঁত ফুলের মাদকতায় সুবাসের মধ্যে এই সিক্তবসনা গৌরাঙ্গীবধূকে ঘড়া কাঁখে যেতে দেখল। বসন্তের শেষ, ঈষৎ গরম পড়েছে—নতুবা তুঁত ফুলে সুবাস ছড়াবে কেন?

তুলসী দারোগা ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাঁহাবাজ দারোগা—'হয়'কে 'নয়' করবার এমনওস্তাদ আর ছিল না। চরিত্র হিসেবেও নিষ্কলঙ্ক ছিল, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই।তুলসী দারোগার নামে এ অঞ্চলে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। তার সুনজরে একবার যিনি পড়বেন, তার হঠাৎ উদ্ধারের উপায় ছিল না। এ হেন তুলসী দারোগা হঠাৎ উন্মনা হয়েপড়লো সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে নির্জন নদীতীরের পথে দেখে। বধূটিকে সন্ধান করবার লোকওলাগালে। হরি যুগীকে দু'তিনবার থানায় যেতে হল দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তুনিস্তারিণী ছিল অন্য চরিত্রের মেয়ে, শোনা যায় তুলসী দারোগার পাঠানো বৃন্দাবনী শাড়ি সে পাদিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বলেছিল, তাদের কলাবাগানের কল্যাণে অমন শাড়ি সে অনেক পরতেপারবে; জাতমান খুইয়ে বৃন্দাবনী কেন, বেনারসী পরবার শখও তার নেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে তুলসী দারোগা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়।

আর একজন লোক কিন্তু কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করেছিল অন্যভাবে। গ্রামের প্রান্তেগোঁসাইপাড়া, গ্রামের মধ্যে তারা খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ প্রায় জমিদার। বড় গোঁসাইয়ের ছেলেরতিকান্ত নদীর ধারে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে—শীতকাল। হঠাৎসে দেখলে কাদের একটি বউ ঘড়াসুদ্ধ পা পিছলে পড়ে গেল—খুব সম্ভব তাকে দেখে।রতিকান্ত কলকাতায় থাকত, দেশের ঝি-বউ সে চেনে না। সে ছুটে গিয়ে ঘড়াটা আগে হাঁটুর ওপর থেকে সরিয়ে নিলে, কিন্তু অপরিচিতা বধূর অঙ্গ স্পর্শ করলে না। একটু পরেই সে দেখলে বধূটি মাটি থেকে উঠতে পারছে না, বোধহয় হাঁটু মচকে গিয়ে থাকবে। নির্জন বনপথ, কেউ কোনদিকে নেই, সে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—মা, উঠতে পারবে না হাত ধরে তুলব?

তারপর সে অপরিচিতার অনুমতির অপেক্ষা না করেই তার কোমল হাতখানি ধরে বল্লে—ওঠ মা আমার ওপর ভর দিয়ে, কোনো লজ্জা নেই—উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করো তো—

কুণ্ঠিতা সঙ্কুচিতা বধূ ছিল না নিস্তারিণী। সে ছিল যুগীপাড়ার বউ—তাকে একা ঘাটথেকে জল আনতে হয়, ধান ভানতে হয়, ক্ষার কাচতে হয়—সংসারের কাজকর্মে সে অনলস, অক্লান্ত। যেমনি পরিশ্রম করতে পারে,

তেমনি মুখরা, আর তেমনি সাহসিকাও বটে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের গৌরবে তখন তার নবীন বয়সের নবীন চোখ দুটি জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে।

সে উঠে দাঁড়াল, রতিকান্তের সঙ্গে কিন্তু কোনো কথা বল্লে না। বুঝতে পারলেগোঁসাইপাড়ার বাবুদের ছেলে তার সাহায্যকারী। বাড়ি গিয়ে দু-তিন দিন পরে সে স্বামীকেদিয়ে একছড়া সুপক্ক চাঁপাকলা ও নিজের হাতের তৈরি বাঁশশলা ধানের খইয়ের মুড়কী পাঠিয়েদিলে গোঁসাইবাড়ি। বল্লে—আমার ছেলেকে দিয়ে এসো গে—

নিস্তারিণী সেই থেকে সেই একদিনের দেখা সুদর্শন যুবকটিকে কত কি উপহার পাঠিয়ে দিত। রতিকান্তের সঙ্গে আর কিন্তু কোনোদিন তার সাক্ষাৎ হয়নি, গোঁসাই-বাড়ির ছেলেযুগীবাড়িতে কোনো প্রয়োজনে কোনোদিন আসেনি।

রতিকান্ত কলকাতাতেই মারা গিয়েছিল অনেকদিন পরে। নিস্তারিণীর দু'তিন-দিন ধরেচোখের জল থামেনি, এ সংবাদ যখন সে প্রথম শুনলে।

গ্রামের অবস্থা তখন ছিল অন্যরকম। সকলের বাড়িতে গোলাভরা ধান, গোয়ালে দু-তিনটি গোরু থাকত। সব জিনিস ছিল সস্তা। নিস্তারিণীদের বাড়ির পশ্চিম উঠানে ছোট একটা ধানের গোলা। কোনো কিছুর অভাব ছিল না ঘরে। বরং ব্রাহ্মণপাড়ার অনেককে সেসাহায্য করেছে।

একবার বড্ড বর্ষার দিনে সে বাড়ির পিছনের আমতলায় ওল তুলচে—এমন সময়বাঁড়ুয্যে বাড়ির মেয়ে ক্ষান্তমণি এসে বল্লে—ও যুগী-বউ!

নিস্তারিণী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। বাঁড়ুয্যেবাড়ির মেয়েরা কখনো তাদের বাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। সে বল্লে—কি দিদিমণি?

—একটা কথা বলব?

—কি, বলো দিদিমণি—

—আমাদের আজ একদম চাল নেই ঘরে। বাদলায় শুকুচ্চে না, কাল ধান ভেজে দুটো চিঁড়ে হয়েছিল। তোমাদের ঘরে চাল আছে, কাঠাখানেক দেবে?

নিস্তারিণী এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, তার খাণ্ডার শাশুড়ি কোনোদিকে আছে কিনা। পরে বল্লে—দাঁড়াও দিদিমণি—দেবানি চাল, ঘরে আছে। শাশুড়িকে লুকিয়ে দিতি হবে—দেখতি পেলে বড় বকবে আমারে। তা বকুক গে, তা বলে বামুনের মেয়েকে বাড়ি থেকেফিরিয়ে দেব!

আর একবার বাঁড়ুয্যেবাড়ির বউ তার বৃদ্ধা শাশুড়িকে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; সে বউ ছিল গ্রামের মধ্যে নামডাকওয়ালা খাণ্ডার বউ—শাশুড়ির সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া বাধাতো, কেরোসিনের টেমি ধরিয়ে শাশুড়ির মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাড়ার কেউ ভয়ে বৃদ্ধাকেস্থান দিতে পারেনি, যে আশ্রয় দেবে তাকেই বড় বউয়ের গালাগালি খেতে হবে। যুগী-বউদেখলে বাঁড়ুয্যেবাড়ির বেড়ার কাছে বড় সেগুনতলার ছায়ায় ন'ঠাকরুণ চুপ করে দাঁড়িয়েহাপুসনয়নে কাঁদছেন। গিয়ে বল্লেন—ন'ঠাকরুণ, আসুন আমাদের বাড়ির দাওয়াতে বসবেন—বড় বউ বকেছে বুঝি?

ন'ঠাকরুণ শুচিবেয়ে মানুষ, তা ছাড়া বাঁড়ুয্যেবাড়ির গিন্নি হয়ে যুগী-বাড়ি আশ্রয় নিলেমান থাকে না। সুতরাং প্রথমে তিনি বল্লেন—না বউ, তুমি যাও, আমার কপালে এ যখনচিরদিনের, তখন তুমি একদিন বাড়িতে ঠাঁই দিয়ে আমার কি করবে! নগের বউ যেদিন চটকাতলায় চিতেয় শোবে, সেদিনটি ছাড়া আমার শান্তি হবে না মা। ওই 'কালনাগিনী' যেদিনআমার নগের ঘাড়ে চেপেচে—

নিস্তারিণী ভয়ে ভয়ে বল্লে—চুপ করুন ন'গিন্নি, বউ শুনতি পেলি আমার এস্তক রক্ষেরাখবে না। আসুন আপনি আমার বাড়িতে, এইখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাবেন কেন মিথ্যে—

ন'গিন্নিকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সে নিজের হাতে তাঁর পা ধুয়ে দিয়ে সিঁড়ি পেতে দাওয়ায়বসালে। কিছু খেতে দেয়ার খুব ইচ্ছে থাকলেও সে বুঝলে, বড় ঘরের গিন্নি ন'ঠাকরুণ এবাড়িতে কোনো কিছু খাবে না, খেতে বলাও ঠিক হবে না, সে ভাগ্য সে করেনি।

অনেক রাত্রে গিন্নির বড় ছেলে নগেন খুঁজতে খুঁজতে এসে যখন মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল, তখন নিস্তারিণী অনেক অনুনয়-বিনয় করে বড় একছড়া মর্তমান কলা তাকে দিয়ে বল্লে—নিয়ে যান দয়া করে। আর তো কিছুই নেই, কলাবাগান আছে, কলা ছাড়া মানুষকে হাতে করেআর কিছু দিতে পারিনে—

তার স্বামী সেবার রামসাগরের চড়কের মেলায় মনোহারী জিনিস বিক্রি করতে গেল। যাবার সময় নিস্তারিণী বল্লে—ওগো, আমার জন্যি কি আনবা ?

—কি নেবা বলো? ফুলন শাড়ি আনব?

—না, শোনো, ওসব না। একরকম আলতা উঠেচে আজ মজুমদার-বাড়ি দেখে এলাম।কলকেতা থেকে এনেচে মজুমদার মশায়ের ছেলে—শিশিনিতে থাকে। কি একটা নাম বল্লে, ভুলে গিইচি!

—শিশিনিতে থাকে ?

—হ্যাঁ গো। সে বড় মজা, কাটির আগায় তুলো দেওয়া, তাতে করে মাখাতে হয়। ভালকথা, তরল আলতা-তরল আলতা—

—কত দাম?

—দশ পয়সা। হ্যাঁগা, আনবে এক শিশিনি আমার জন্যি ?

—দ্যাখব এখন। গোটা পাঁচেক টাকা যদি খেয়েদেয়ে মুনাফা রাখতি পারি, তবে এক শিশিনি ওই যে কি আলতা—তোর জন্যি ঠিক এনে দেব।

এইভাবে গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার সাথে টেক্কা দিয়ে নিস্তারিণী প্রসাধনদ্রব্য ক্রয় করেছে।তাদের পাড়ার মধ্যে সে-ই সর্বপ্রথম তরল আলতা পায়ে দেয়। শূদ্রপাড়ার মধ্যে ও জিনিসএকেবারে নতুন—কখনো কেউ দেখেনি। আলতা পরবার সময়ে যে দেখতো সে-ই অবাকহয়ে থাকত। হাজরী বুড়ি মাছ বেচতে এসেচে একদিন—সে অবাক হয়ে বল্লে—হ্যাঁ বড় বউ, ও শিশিনিতে কি? কি মাখাচ্চ পায়ে ?

নিস্তারিণী সুন্দর রাঙা পা দু'খানি ছড়িয়ে আলতা পরতে বসেছিল, একগাল হেসেবল্লে—এ আলতা দিদিমা। এরে বলে তরল আলতা।

—ওমা, পাতা আলতাই তো দেখে এসেচি চিরকাল। শিশিনিতে আলতা থাকে, কখনো শুনিনি। কালে কালে কতই দ্যাখলাম। কিন্তু বড় চমৎকার মানিয়েছে তোমায় পায়ে বউ—এমনিটুকটুকে রং, যেন জগদ্ধাত্রী পিরতিমের মতো দেখাচ্চে—

এ সব ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

শীতের সকালবেলা। ওদের বড় ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে নিস্তারিণী শুয়ে আছে। সংসারের সাবেক অবস্থা আর নেই, হরি যুগী বহুদিন মারা গিয়েছে—হরি যুগীর একমাত্র ছেলে সাধনও আজ তিন-চার বছর একদিনের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়েছে। সুতরাং নিস্তারিণী এখন স্বামী-পুত্রহীনা বিধবা। তার শাশুড়ি এখনো বেঁচে আছে, আর আছে একবিধবা জা, জায়ের এক মেয়ে, এক ছেলে।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের সে উচ্ছলযৌবনা সুন্দরী গ্রাম্য বধূটিকে আজ আর রোগগ্রস্তা, শীর্ণকায়া, মলিনবসনা প্রৌঢ়ার মধ্যে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। হরি যুগীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেতাদের সে গোয়ালভরা গোরু ও গোলাভরা ধান অন্তর্হিত হয়েছে—ঘরের চালে খড় নেই, তিন চার জায়গায় খুঁটি দেওয়া খসে-পড়া চালে বর্ষার জল আটকায় না। গত বর্ষায় চালেরওপর উচ্ছেলতা গজিয়ে একদিকে ঢেকে রেখেচে, মাটির দাওয়ায় খানিকটা

ভেঙে পড়েছে, পয়সার অভাবে সারানো হয়নি। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। সংসারের কর্তা, যার আয়ে সংসারেরশ্রী, সে চলে যাওয়ায় নিস্তারিণীর আদর এ বাড়িতে আর নেই। আগে ছিল সে-ই সংসারেরকর্ত্রী, এখন তাকে পরের হাত-তোলা খেয়ে থাকতে হয়—তার ছেলে সাধন বাপের মনোহারীদোকান আর কলাবাগান কোনো রকমে বজায় রেখেছিল।

তিন বছর আগের এক ভাদ্র মাসে খুব বৃষ্টির পরে সাধন নদীর ধারে কলাবাগানে কাজকরতে গিয়ে সেখানে মারা যায়। কেন মারা যায় তার কারণ কিছু জানা যায়নি। সন্ধ্যা পর্যন্ত সাধন ফিরল না দেখে তার ঠাকুরমা নাতিকে খুঁজতে বার হচ্চে, এমন সময় বেলেডাঙার দুজনমুসলমান পথিক এসে খবর দিলে—সাধন মুখ গুঁজড়ে কলাবাগানের ধারের পথে কাদার ওপরেপড়ে আছে—দেহে বোধ হয় প্রাণ নেই।

সকলে ছুটতে ছুটতে গেল। গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। সকলে গিয়ে দেখলে সাধন সত্যিই উপুড় হয়ে কাদার ওপর পড়ে, সর্বাঙ্গ কাদা মাখা, তার ওপর দিয়ে এক পশলা বৃষ্টিওহয়ে গিয়েছে। যেখানে শুয়ে আছে সেখানটা রক্ত পড়ে অনেকখানি জায়গা রাঙা, খানিকটাবৃষ্টির জলে ধুয়েও গিয়েছে। রক্তটা পড়েছে সাধনের মুখ থেকে।

গরিবের ঘরের ব্যাপার, দু'দিনেই মিটে গেল। সংসারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ল ক্রমে বাড়িতে উপার্জনক্ষম পুরুষমানুষের মধ্যে বাকি কেবল হরি যুগীর ভাই যুগলেরছেলে বলাই। যুগলও বহুদিন পরলোকগত। দাদার মৃত্যুর পর-বৎসরেই সে বিধবা স্ত্রী ওদু'বছরের শিশুপুত্রকে রেখে মারা যায়। বলাই এখন ষোলো বছরের, বেশ কর্মঠ, স্বাস্থ্যবানবালক।

নিস্তারিণীকে এখন আদর করে 'নিস্তার' বা 'বড়বউ' বলে কেউ ডাকে না—যে ডাকত সে নেই। এখন তার নাম 'সাধনের মা'। কেউ ডাকে পিন্টুর ঠাম্‌মা। পিন্টু সাধনের শিশুপুত্র—এখনতার তিন বছর বয়েস। সাধনের বিধবা বউয়ের বয়স এই সবে সতেরো।

নিস্তারিণী ডাক দিল—ও পিন্টু, পিন্টু—

পিন্টু উঠোনের আমতলায় খেলা করছিল, কাছে এসে বল্লে—কি ঠাক্‌মা?

—তোর মাকে একবার ডেকে দে—

পিন্টুর ডাকে তার মা এসে দাওয়ার ধারে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি হয়েচে, ডাকচো কেন ?

—আমি আজ দুটো ভাত খাব, বল তোর ঠাকুরমাকে—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে—ভাত বল্লিই অমন ভাত! খাবা কোথা থেকে? সে আমিবলতে পারব না ঠাকুরমাকে।

—তবে একগাল খই কি চিঁড়েভাজা যা হয় দে এখন—খিদেয় মলাম—

—হ্যাঁ, আমি তোমার জন্যি বামুনপাড়ায় বেরুই লোকের দোর-দোর। অসুখ হয়েছে চুপকরে শুয়ে থাকো বাপু।

ওরা ওই রকম। সাধনের বউ মুখঝঙ্কার দেয়, তাকে একেবারেই মানে না। সেকালেরআর একালের মেয়েতে কি তফাত, তাই সে ভাবে এক এক সময়ে। তারও একদিন সতেরোবছর বয়স ছিল, কখনো শাশুড়ির একটা কথার অবাধ্য হতে সাহস হত তার? আশ্চর্যি!

একটু পরে নিস্তারিণীর শাশুড়ি এসে দূরে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি হ্যাঁ বউ, তোমারআক্কেলখানা কি? আজ নাকি ভাত খেতে চেয়েচ? জ্বর রয়েছে চব্বিশ পহরের জন্যি, ভাতখেলেই হল অমনি? ...বলি সোয়ামী খেয়েচ পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ—এখনো খাওয়ারসাধ মেটেনি তোমার ?

নিস্তারিণী বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে অসুখে—তবু সে বল্লে, সোয়ামী পুত্তুর তো তুমিওখেয়েছিলে, তবুও তিন পাথর করে ভাত মারো তো তিনটি বেলা! লজ্জা করে না বলতি!

নিস্তারিণীর শাশুড়ি এ কথার উত্তরে চিৎকার করে গালাগালি দিয়ে এক কাণ্ডই বাধালে।সাধনের বউকে ডেকে বলে দিলে—ওকে কিছু খেতে দিবিনে আজ বলে দিচ্চি। এ সংসারে যেখাটবে সে খাবে। আমরা সবাই মায়ে-ঝিয়ে খাটি, ও শুধু শুয়ে থাকে। রোগ নিয়ে শুয়ে থাকলিএ সংসারে চলে না। তার ওপর আবার যে সে রোগ নয়, ওকে বলে পাণ্ডুর রোগ। মুখ হলদে, চোখ হলদে, হাত-পা ফুলেচে, ও কি সহজ রোগ! ও আর উঠবেও না, খাটবেও না, কেবলশুয়ে শুয়ে পাথর পাথর খাবে!

নিস্তারিণী বল্লে—খাব—খাব, বেশ করব। আমার খোকা কলাবাগান সামলে রাখতো, তারই আয়ে বাড়িসুদ্ধখাওনি? সেই কলাবাগান তদ্বির করতে গিয়েই বাছা আমার চলে গেল।তোমরা ওদের বাপছেলের রক্ত-জল-করা কলাবাগান, মনিহারা ব্যবসা ঘোচালে, এখন আমায় বসিয়ে খেতে দেবে না তো কি কিরবে? নিশ্চয়ই দিতে হবে।

—বাসি আখার ছাই খেয়ে দেব। ডাইনি রাক্ষুসি—আমার সংসার তোর দিষ্টিতে জ্বলে পুড়ে গেল! নইলে কি না ছেল, গোলাভরা ধান ছেল না ? হাঁড়ি-ভর্তি ডালডুল, গোয়ালভর্তিগোরুছাগল—ছেলো না নাকি?

উভয় পক্ষের চেঁচামেচি শুনে ওর জা নির্মল সেখানে এসে পড়ল। এটি হরি যুগীর ছোটভাই যুগলের বিধবা স্ত্রী। এর একমাত্র পুত্র বলাই এই সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষমানুষ। বলাইয়ের বয়েস এই উনিশ বছর।

বলাই বাঁশ কিনে গাড়ি বোঝাই দিয়ে রেলস্টেশনে নিয়ে যায়, সেখান থেকেমালগাড়িতে উঠিয়ে কলকাতায় পাঠায়। গত বছরখানেক এ ব্যবসা করে সে গোটা পঞ্চাশ টাকাহাতে জমিয়েচে—মা'র হাতেই এনে দিয়েছে সে টাকা। নির্মলা আবার সে টাকাটা থেকে কুড়িটাটাকা শাশুড়িকে দিয়েছে। বুড়ি সেই টাকায় পাশের গ্রাম থেকে দুধ কিনে এ গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায়যোগান দেয়, তাতেও সামান্য কিছু লাভ থাকে। বুড়ির বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেলেও সে এখনোদুপুর রোদে সারা পাড়া সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায় দূর-দূরান্তরের চাষাগাঁয়ে হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম সংগ্রহ করতে যায় ব্রাহ্মণ পাড়ায় বিক্রি জন্যে।

নির্মলা নিজেও বসে থাকে না, তিনু গাঙ্গুলীর বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে মাসে দু'টাকামাইনে পায়।

সুতরাং এ সংসারে এখন নির্মলার প্রতিপত্তিই বেশি। নিস্তারিণীর দিন সকল রকমেই চলেগিয়েচে। এখন নির্মলার ছেলে বলাই পয়সা আনে, নির্মলা নিজে পয়সা আনে, বলাইয়েরপয়সায় ওর ঠাকুরমা দুধের যোগান দিয়ে কিছু আয় করে। নিস্তারিণী শীর্ণ পাণ্ডুর দেহেউত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত অবস্থায় শুধু 'খাই খাই' করে রোগের দুষ্টক্ষুধায় অবোধ বালিকারমতো। হরি যুগী বেঁচে থাকলে তার সে অন্যায় আবদার খাটতো, সাধন বেঁচে থাকলেওখাটতো—আজ তার আবদার কান পেতে শোনবার লোক কে আছে এ সংসারে ?

নির্মলার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ-বেশ ধপধপে ফর্সা, কৃষাঙ্গী, মুখচোখ ভালই, মাথায়এখনো একটাল চুল, চুলে একটিও পাক ধরেনি। যুগীদের মেয়েরা সাধারণত সুন্দরী হয়েথাকে। নির্মলার মেয়ে তারাও বেশ সুন্দরী। তারা বলাইয়ের ছোট, এই মাত্র চোদ্দো বছর বয়েস।আজ বছর দুই হ'ল এই গ্রামেই তার বিয়ে হয়েছে।

নির্মলা এসে বল্লে—দিদি, চেঁচিও না। ঝগড়া করে মরচো কেন?

নিস্তারিণী কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—দ্যাখ দিকি ছোট বউ, আমায় কিনা রাক্ষুসি, ডাইনি বলে! আমি নাকিএসে ওনার সংসারে আগুন নাগিয়ে দিইচি! আমার সোয়ামী পুত্তুরের অন্ন উনি কোনোদিন বুঝি দাঁতে কাটেননি—

নির্মলা বল্লে—সেতো তুমিও ওনাকে বলেচো। যাক্, এখন চুপটি করে শুয়ে থাকো।

—ওছোটবউ, আমিদুটোভাত—

—না, আজ না। তোমার গা ফুলেচে, মুখ ফুলেচে—তুমি ভাত খাবে কি বলে আজ?

—তা হোক, তোর পায়ে পড়ি—

—আচ্ছা এখন চুপ করো, বেলা হোক। ভাত রান্না হোক, আমি বলব তখন।

নিস্তারিণীর হাত, পা, মুখ ফুলেচে একথা ঠিকই। বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েছে একথা ঠিকই। কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গিয়েছে তার, ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না—এমনখারাপ দেখতে হয়েছে ও। যত্ন করবার কেউ না থাকাতে আরো দিন দিন ওর অবস্থা খারাপতরহয়ে উঠেছে। খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু আগ্রহ করে খেতে দেবার কেউ নেই। রোগীর পথ্য তোদূরের কথা, দুটি ভাত তাই কেউ দেয় না।

ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সে নাতিকে ডেকে চুপিচুপি বল্লে—পিন্টু, দুটো পেয়ারা আনতে পারিস?

পিন্টুর মা ছেলেকে বলে—খবরদার, যাবিনি বুড়ির কাছে! ওর পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, ছোঁয়াচে রোগ। ছেলে খেয়ে বসে আছে ডাইনি, আবার নাতিকে খাবার যোগাড় করচে—ঠ্যাঙভেঙে দেব যদি ওর কাছে যাবি—

বেলা দুপুরের পরে সে ভীষণ জ্বরে বিকেল পর্যন্ত অঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল— কখন যে এ বাড়ির লোকে খাওয়াদাওয়া করেচে তা সে কিছুই জানে না। যখন তার খানিকটা জ্ঞান হল, তখন ভাদ্র মাসের রোদ প্রায় রাঙা হয়ে উঠোনের আমগাছটা, বাঁশঝাড়গুলোর আগায় উঠে গিয়েচে। মুখের কথাটা খুলে দিয়েই ও চিঁ-চিঁ করে প্রথমেই ডাকলেও পিন্টু, পিন্টু—

পিন্টু কোথা থেকে ছুটে এসে বল্লে—কি ঠাম্মা?

—আমার জন্যি সেই পেয়ারা আনলি?

—না, ঠাম্মা।

—আনিস্‌নি? ছেলেমানুষ ভুলে গিয়েচিস? বোসএখানে।

কিন্তু পিন্টু বসতে ভরসা পায় না, মা দেখতে পেলে মার খেতে হবে। সে আনমনে খেলা করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল। একটু পরে নিস্তারিণী আবার ডাকলেও ছোট—ছোট বউ—

কেউ উত্তর দিল না, কারণ এ সময়ে বাড়িতে কেউ থাকে না।

আরো দু'বার ডাক দিয়ে নিস্তারিণী অবসন্ন হয়ে পড়ল, তার বেশি চেঁচামেচি করবারক্ষমতা নেই।

বেশ খানিকক্ষণ পরে নির্মলার মেয়ে তারা এসে বল্লে—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, ডাকছিলে?

নিস্তারিণী চিঁ-চিঁ করতে করতে বল্লে—কাতরে কাতরে মরে গেলাম, তা যদি তোমাদের একজনও উত্তর দেবে! একজন এমন রুগী বাড়িতে রয়েছে—বোস এখানে একটু—

তারা ওর মায়ের মতো ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী বালিকা। নতুন বিয়ের কনে, পাশেই শ্বশুরবাড়ি। নবীন যুগীর ছেলে অভিলাষ তার স্বামী। এইমাত্র শ্বশুরবাড়ি থেকেই আসছে।আসবার কারণ অন্য কিছু নয়, অভিলাষ এখুনি গরম মুড়কি মেখেচে, বালিকা স্ত্রীকে আদর করে বলেচে, তোদের বাড়ি থেকে ধামি নিয়ে আয়, মুড়কি খেতে দেব। এই জন্যেই তার আগমন। রোগগ্রস্ত জ্যাঠাইমা বুড়ির বকুনি শুনবার জন্যে সে এখন এখানে বসতে আসেনি। সুতরাং সে বিব্রত মুখে বল্লে ও জ্যাঠাইমা, আমি এখন বসতে পারব না, তোমার জামাই মুড়কি মেখেচে, নিয়ে বেলেডাঙায় ফিরি করতে বেরুবে—

—তোরমা কোথায় ?

—বাড়িতে কেউ নেই। মা গাঙ্গুলী-বাড়ি কাজ করতে গিয়েছে, ঠাকুমা নরহরিপুরে হাঁসের ডিম আনতে গিয়েছে—

—পিন্টুর মা কোথায়?

—ওইযে শিউলি তলায় বসে বাসন মাজচে—

—একটু ডেকে দিয়ে যা দিকিমা—

পরে সুর খুবই নীচু করে বল্লে—মা দুটো মুড়কি অভিলাষের কাছ থেকে নিয়ে আয়না, আমার নাম যেন করিসনে—

তারা বল্লে — সে আমি পারবনা। অসুখ-গায়ে মুড়কি খাবেকি? তারপর শেষ কালে ঠাক্‌মা টের পেলে আমায় বকে ভূত ঝাড়াবে। চল্লাম আমি—ও বউদিদি, শুনে যাও জেঠিমা ডাকছে—

পুত্র বধূ বিরক্ত মুখে এসে দূরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্লে—বলি ডাকের ওপর ডাক কেন অত? আমার সংসারে কাজকর্ম নেই, না তোমার কাছে বসে থাকলে চলবে? কি বলচো বলো—

নিস্তারিণী কাতর সুরে বল্লে—তা রাগ করিস নে আমার ওপর বউমা, আমায় দুটো ভাতদে—

—দিই! জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছ, ভাত না খেলে কি চলে!

—তবে আমি কি খাব, খিদে পায় না?

—আমি জানিনে। আদিখ্যেতার কথা শোনো! খিদে পায় তা আমি কি করব? ঠাক্‌মাএলে বলো, ঠাক্‌মা না বল্লি আমি ভাত দিতি পারব না।

—পিন্টু কোথায় ? একটু ডেকে দে আমার কাছে—বড্ড ইচ্ছে করে দেখতি—

পুত্রবধূ ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—অত সোহাগে আর কাজ নেই। ছেলের মাথা খেয়েবসে আছে, এখন নাতিটি বাকি!

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—অমন করে বলতি নেই, বউমা। তা দে ডেকে, কিচ্ছু হবে না, দে একবার ডেকে—

পুত্রবধূ হাত-পা নেড়ে বল্লেনা—না—হবে না। তোমার পাণ্ডুর রোগ হয়েচে, বিশ্রীছোঁয়াচে রোগ—আমি ছেলে পাঠাতি পারব না তোমার কাচে। গেলি আমারই যাবে—তোমার কি!

কথা শেষ করেই মুখ ঘুরিয়ে পুত্রবধূ চলে গেল। নিস্তারিণীর দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর করেজল গড়িয়ে পড়ে ছেঁড়া, ময়লা, তেলচিটে বালিশটা ভিজিয়ে দিলে। এমন কথাও লোককেলোকে বলে—তাও নিজের পুত্রবধূ! সাধনের নাম রেখেচে ওই ধুলোগুঁড়োটুকু— ওই অবোধশিশু। মাস সাতভেয়ে কালী তার মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।—সে না তার ঠাকুরমা, বউমা বলেকিনা, গেলে তারই যাবে!

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নির্মলা বামুনবাড়ির কাজকর্ম সেরে ফিরে এল। বড় জায়ের কাছে গিয়ে বল্লে—কেমন আছ দিদি? দেখি, গা দেখি—

নিস্তারিনী না-ঘুম না-জ্বরে আচ্ছন্ন মতো হয়ে পড়েছিল, কপালে ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শপেয়ে জেগে উঠে বল্লে—কে? ছোট বউ? তুই আবার আমায় ছুঁলি কেন? তোর পাছে পাণ্ডুর রোগ হয়—আজ আমায় বউমা বলেছে—হ্যাঁ ছোটবউ, সাধনের ছেলে আমার কেউ নয় ? বলো তুমি—

নিস্তারিণী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। নির্মলা বল্লে — চুপ করো চুপ করো দিদি, সবই তোমার কপাল। পিরতিমের মতো বউ ছিলে, সবতো দেখেচি। স্বভাব-চরিত্তির সম্বন্ধে কেউ একটা কথা বলতি পারেনি কোনোদিন।

—কেন, দেওরদের কোলে পিঠে করে মানুষ করিনি? আমি যখন ঘর করতি এলাম, তোর সোয়ামী তখন ন' বছরের ছেলে। আমার পাত থেকে বেগুন পোড়া ভাত মেখে খেতো, আর আজ আমি হইচি নাকি ডাইনি—

—চুপ করো দিদি। এসব কথা আমি সব জানি। এখন কিখাবে তাই বলো—

নিস্তারিণী মিনতির সুরে বল্লে—দুটো ভাত—

—না, আমায় বকিও না। সারাদিন কাজ করে দুঃখধান্দা করে এলাম। দুটো মুড়ি নিয়েএসেচি—

—শোন ছোটবউ, অভিলাষ আজ গরম মুড়কি মেখেচে, তারা বলে গেল—

—না, সে সব হবে না। গুড়ের মুড়কি জ্বর হলে খায় না। দুটো তেলনুন দিয়ে মুড়ি মেখে দিগে, খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে আজ রাতির মতো পড়ে থাকো। শুনেচ কাণ্ড, বাজারে নাকি চালের পালি দেড় টাকা! ভাত আর খাতি হবে না। বলাই আর কত রোজগার করবে, কি করে এই বিধবার পুরী চালাবে? ধান ফুরিয়ে এসেচে, এবার আমাদের মতো গরিবদের না খেয়েমরণ।

নিস্তারিণী স্তব্ধ হয়ে শুনল। অসুস্থতার দরুন সে বহুদিন অবধি বৈষয়িক ব্যাপারে নিস্পৃহ, তবুও দেড় টাকা এক পালি চাল শুনে সে যেন অত জ্বরের ঘোরের মধ্যেও চমকে গেল।সেকালে যে তাদের গোলার ধান বিক্রি হয়েচে,আঠারো আনা করে সরু বাঁশসলা কিচামরমণি ধানের মণ। মনে আছে, একবার তার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশনের জন্য গোলা থেকেপঁচিশ টাকার ধান বিক্রি হয়—পাঁচ সিকা ছিল এক মণ ধানের দাম।

নিজের হাতে সে কত ধান বিলিয়ে দিয়েছে...একবার গাঁয়ে আকাল হয়েছিল, টাকায়সাড়ে তিন সের হয়ে উঠল চালের দাম। বামুনপাড়ার মেজ গিন্নি একদিন তাকে বাড়িতে ডেকেবল্লেন,—"বউ, তোমায় একটা কথা বলি—খাওয়াদাওয়ার বড় কষ্ট, দু'মণ ধান আমাকে ধারদিতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমার কোনো অভাব নেই। গোলা আরো উথলে উঠুক তোমার।" সে শাশুড়িকে লুকিয়ে দু'মণ ধান বার করে দিয়েছিল গোলা থেকে। শাশুড়ি চিরকালের খাণ্ডার, কাউকে কিছু জিনিস দেওয়া পছন্দ করতো না কখনো। কিন্তু তখনকার দিনে এ সংসারে তারপ্রতিপত্তি ছিল অন্যরকম। সে যা করবে তাই হবে। তার ওপর কথা বলবার কেউ ছিল না।কোথায় গেল সে সব দিন!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। নির্মলা এক বাটি দুধ নিয়ে এসে বল্লে—ও দিদি, খেয়ে নাওএকটু দুধ।

নিস্তারিণী বল্লে—আমার এখানে একটু বোসছোটবউ—কেউ বসে না।

নির্মলার বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসবার জো নেই। এক্ষুনি সব খেতে চাইবে, শেষরাত্রে উঠে চার কাঠা ধানের চিঁড়ে কুটতে হবে বাঁড়ুজ্জেদের।

তারপর আবার যে একা সেই একা। সারা দিনরাত আজ একটি মাস ধরে একাই শুয়ে থাকতে হচ্ছে। নির্মলা তাকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একদিন দু'দিন করে কতদিন যে কাটল, নিস্তারিণীর কোনো খেয়াল নেই। কেবল আবছা আবছা দিনগুলো আসে, সে সবই দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিঃসঙ্গ, কেবল ছোট খোকা পিন্টুকে দেখতে ইচ্ছে করে...কিন্তু তার মা তাকে পাঠায়না, একটুও বসতে দেয়না কাছে। পুত্রবধূ হয়ে শাশুড়িকে দেখতে পারেনা...তার নাকি ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে বলে। আরকে বল সবাই বকে, সবাই বকে।

একদিন সে শুয়ে শুয়ে লক্ষ করলে, আর আকাশে বৃষ্টি হয় না। হলুদে রঙের রোদ বাঁশঝাড়ে, আমগাছের মাথায়। তেলাকুচোলতায় সাদাসাদা ফুল ধরেছে, বলাইয়ের হাতে পোঁতা উঠোনের রাঙা ডাঁটা শাক ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বর্ষাকাল তাহলে চলে গিয়েছে!

পুত্রবধূ আমতলায় কাঠ কাটছে, জিগ্যেস করলে ওবউমা, এটা কি মাস?

—সে খোঁজে কি দরকার তোমার?

—বলো না বউমা?

—শেষা ভাদ্দর। তোমার কি হুঁশ-পোড়েন আছে? সেদিন চাপড়া ষষ্ঠীগেল, খোকাকে তোমার আশীর্বাদ করা দরকার, তোমার কাছে গিয়ে ডাকলে, তা যদি একটা কথা বল্লে—

বিকেলে ও-পাড়ার বুধো গোয়ালার মা দেখা করতে এসে বল্লে—ওমা, এ কি চেহারাহয়ে গিয়েছে! আহা, কতদিন হয়েচে আসিনি—বলি শুনচি বড্ড অসুখ, একবার দেখে আসি। উদুরী হয়েছে বুঝি, পেট যে ফুলেচে বড্ড। সোনার পিরতিমে চেহারা ছিল বউমার। আমি তোআজকের লোক নই, যখন হরি প্রথম বিয়ে করে এল—ওই আমতলায় দুধে আলতার পিঁড়িতেদাঁড়াল, বেশ মনে আছে, রূপে একেবারে ঝল্‌ক দিয়ে গেল যেন। সে চেহারার আর কিছু নেই। এমন নক্ষী বউ—আহা, তার এত কষ্টও ছেল অদেষ্টে।

নিস্তারিণী যেন সব বিষয়ে নিস্পৃহ, উদাসী হয়ে পড়েছে। এ সব কথা শুনে যায় বটে, কিন্তু কার বিষয়ে কে যেন কথা বলছে! সেকালের সে বড়বউ তো কোন্ কালে মরে হেজে গিয়েছে! সে রূপসী লক্ষ্মীর মতো সংসারজোড়া বড়বউ কোথায় আজ?...কেবল খেতে ইচ্ছেহয়। পান্তাভাত কতকাল খায়নি। কেউ দেয় না—দেখাই করে না এসে। সন্ধ্যার পরে নির্মলএসে একটু কাছে বসে, বলে—ও দিদি, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি মনিববাড়ি থেকে।

নিস্তারিণী ব্যগ্রভাবে বলে—কি কি?

—চুপ করো। দুটো তালের বড়া। গিন্নি ভাজছে, তা আমাকে খেতে দেলে—

—কতকাল খাইনি! দে।

নির্মলা বেশিক্ষণ বসতে পারে না, রান্নাঘরে খই ভেজে দিতে হবে জামাই অভিলাষকে। তারা বলে দিয়েছে—কাল মুড়কি মাখবে সকালবেলা। সে মুড়কির ব্যবসা করে, কিন্তু খই ভাজাকাজটা মেয়েমানুষের, পুরুষের নয়—ওটা শাশুড়ির বিনা সাহায্যে সম্পূর্ণ হয় না।

রান্নাঘরে যেতে সাধনের বউ বল্লে—কাকিমার বুড়ির কাছে রোজ বসা চাই-ই। অমনফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে—পাপের দেহ তাই কষ্ট পাচ্ছে—নইলে মরে যেত কোনকালে!

নির্মলা ধমক দিয়ে বল্লে—অমন বলিস্ নে বোমা, মুখে পোকা পড়বে। সতী নক্ষী মেয়ের নামে কিছু বোলো না। তোর আপন শাশুড়ি না? তুই ও-সব কথা মুখে বের করিস কি করে? আজই না হয় ও অমন হয়ে গিয়েছে—ও যে কি ছিল, আমি সব দেখিচি। এই সংসারের যা কিছু ঝক্কি চিরকাল ও পুইয়েছে। দেওরদের মানুষ করা, বিয়ে-থাওয়া দেওয়া—ও না থাকলে সংসার টিকত না। আজ না হয় ওর—

সাধনের বউ ঠোঁট উল্টে বল্লে—হোক গে যাক বাপু, ও নিজের ছেলে খেয়েছে—ওর ওপর আমার এতটুকুছেদ্দা নেই, যতই বলো।

—ও খেয়েছে, কি বলিস বউমা! ও ছেলে খেয়েছে! যাবার অদেষ্টে যায় চলে, কার দোষদেব! তা হলে তো তোকেও বলতে পারি—তুই সোয়ামী খেয়েছিস!

এই কথার উত্তরে খুড়শাশুড়ি ও বউয়ে তুমুল ঝগড়া বেধে উঠল।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। পুজো প্রায় এসে পড়েছে। নিস্তারিণী একেবারে উত্থান শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। দিনের অর্ধেক সময় তার জ্ঞান থাকেনা। এক এক বার চেতনা সজাগ হয়ে ওঠে, তখন কেবল এদিক-ওদিক চেয়ে নাতিকে খোঁজে, নির্মলকে খোঁজে। ওর মলিনবিছানা ওর সারাদেহে কেমন একটা দুর্গন্ধ বলে আজকাল কেউই কাছে আসতে চায়না। কেবল খাওয়ার সময় কোনোদিন নির্মলা, কোনোদিন বাসাধনের বউ দুটি ভাত দিয়ে যায়। সেদিন ও চোখমেলে ভাত খাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলেনা। অনেকক্ষণ পরে পুত্রবধূ বল্লে—ভাত খাওনিয়ে, খাইয়ে দেব?

নিস্তারিণী অবাক হয়ে গেল অসুখের ঘোরের মধ্যেও। বল্লে—তাই দে বউমা!

সাধনের বউ ভাত দুটি খাইয়ে এঁটোথালা নিয়ে চলেগেল। একটুপরে নির্মলা বাড়ি এল। রোগীকে দেখতে গিয়ে ওর মনে হল অবস্থা ভাল নয়। আপন মনে বল্লে—ঠাকুর, ওকে মুক্তি দাও, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—

প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেমন নিস্তারিণীর জ্ঞান হয়, আজও তেমনি হল। জা'কে অবোধ বালিকার মতো আবদারের সুরে বল্লে—দুটো পান্তভাত আর ইলিশমাছ ভাজা খাব—

নির্মলা দু'তিনদিন চেষ্টার পরে অতিকষ্টে এইযুদ্ধের বাজারে ইলিশমাছ জুটিয়ে এনেছিল, কিন্তু জা'কে খেতে দিতে পারেনি।

নিস্তারিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে ঝুঁকল পরদিন দুপুর থেকে।

সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃত পথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবনদিনের দেশে। বাঁড়ুজ্জেদের ন'গিন্নি যেন এসে হেসে হেসে বলচেন, 'আমায় আজ দু'কাঠা চাল ধার দিতে হবেবউ। বউমা তাড়িয়ে দিয়েচে বাড়ি থেকে—তুমি না দিলে দাঁড়াব কোথায়?'...সে সব লোককতকাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে। বহুদিন পূর্বের শরৎ-অপরাহ্ণে মতো হাট থেকে ফিরে ওর স্বামী যেন হাসিমুখে বলচে—ও বড়বউ, কলা বিক্রির দরুন টাকাগুলো এই নাও, তুলে রেখে দাও—আর এই ইলিশমাছটা—ভারি সস্তা আজ হাটে—

ওর সব দুঃখ, সব অপমান, অনাদরের দিনের হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে অবসান হল কিভাবে? নিস্তারিণী অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কোন্টা স্বপ্ন—কোন্টাসত্য, সে একগাল হেসে স্বামীর হাত থেকে ইলিশমাছটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।

নির্মলা চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—সতী নক্ষ্মী সগগে চলে গেল—বউমা পায়ের ধুলো নে—তারপর সে নিজেও ঝুঁকে পড়ে মাতৃসমা বড় জায়ের পায়ে হাত ঠেকায়।